গার্সিয়া মার্কেজের সাহিত্যবীক্ষা ঃ জাদুবাস্তবতা এবং তার পরপর

সন্দীপন মজুমদার

‘কবিরা যে বাগানের কথা বলে সেটা কাল্পনিক, কিন্তু
সেখানে যে ব্যাঙগুলো থাকে সেগুলো সব বাস্তব।’

—মার্গারেট মীড

গ্রেগর সামসাকে আমরা সবাই চিনি।

একজন যুবক যে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করল, তার শরীরটা একটা পোকার শরীরে পরিণত হয়েছে। ফ্রাঞ্জ কাফকার ‘মেটামরফসিস’ গল্পটা পড়ার আগে আমরা এই গ্রেগর সামসার সম্বন্ধে অবগত ছিলাম না, কিন্তু সে তো কোথাও ছিলই। আমাদের অস্তিত্বের ভিতর, স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নের ভিতর এক অবয়বহীন তরঙ্গদৈর্ঘ নিয়ে সে হাজির ছিল। যদি না থাকত, তবে আমরা ওকে চিনতে পারতাম না। গল্পটা পড়ার পর বুঝতে পারতাম না যে গ্রেগর সামসা আসলে আমাদের অস্তিত্বের অনপনেয় অংশ।

এরপরে একটা প্রশ্ন উঠে আসবে, অনিবার্যভাবেই। গ্রেগর সামসা যে এভাবে আমাদের অস্তিত্বের কোটরে বাসা বাঁধল, তা কি নেহাতই আপাতিক নাকি তার কোনো সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে? আমাদের অস্তিত্ব যে মূলত একটি সামাজিক নির্মাণ, একথা মেনে নেবার মধ্যে তো বড় কোনো অসঙ্গতি নেই। পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী লিপ্সা মানুষকে যখন শুকনো ছিবড়ে করে দেয় তখন মানুষের এই রূপান্তরকে দেখানোর জন্যই কাফকা স্বভাববাদের (naturailism) আঙ্গিককে ছিন্নভিন্ন করে গ্রেগর সামসাকে আবিষ্কার করেছিলেন। অথচ গেওর্গ লুকাচের মত বড় মার্কসবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক একসময় কাফকাকে বুঝতে পারেন নি। তাঁর কাছে তখন শ্রেয়তর ছিল ধ্রুপদী বাস্তববাদের (Classical Realism) আঙ্গিক, যেখানে সমাজের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব তার সনিষ্ট বাস্তবতার কারণে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। বাস্তববাদের সীমা অবশ্য অতিক্রমণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে শুধু সমাজবাস্তবতার গভীরতাকে প্রকাশ করার জন্যই নয়। আমরা যারা মহাকাব্যের দেশের মানুষ তারা জানিয়ে যা জীবনের চেয়ে বড় তাকে বোঝাতে রূপক ও সাংকেতিকতার সাহায্যে অন্য ভুবনের দরজা খুলতে চেয়েছেন সেই আদিকবির কাল থেকে হালের লোককবি পর্যন্ত সব মন্ময় স্রষ্টা। এসবের আড়ালে বাস্তবতার প্রাচীরগুলো ভাঙার কাজ চলতেই থাকে।

লাতিন আমেরিকার সাহিত্যপাঠের সূত্রে আমাদের সাহিত্যচিন্তায় জাদুবাস্তবতা (magic realism) শব্দটি নতুন মোড়কে আবার ঢুকে পড়ে। ১৯৮২ সালে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের নোবেলপ্রাপ্তি এবং তারপর অনুবাদের মাধ্যমে তার সাহিত্যপাঠ এক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছিল অনেকটাই। মার্কেজের ‘একশ বছরের নিঃসঙ্গতা’ পাঠের অভিজ্ঞতা আমাদের চেনা বাস্তবতার স্তরগুলিকে সরিয়ে এক অদ্ভুত মানসভ্রমণে নিয়ে গিয়েছিল। ৩৩৮ পৃষ্ঠার (ইংরেজি অনুবাদে) একটি উপন্যাসের মধ্যে একটি বংশের পারিবারিক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে সেখানে গোটা মানবসভ্যতার ইতিহাস, নির্মাণ ও ধ্বংসের ইতিবৃত্ত এবং অবলুপ্তির উদ্বেগ ও বিষাদ যেভাবে পাঠককে বিহ্বল করে তোলে তার কোনো তুলনা চট করে মেলা ভার। মার্কেজের যে আঙ্গিক এখানে অদ্ভুত কার্যকরী হয় তা হল উপন্যাসের ঘটমান বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যতের ঘটনাকে টেনে আনা। এই তির্যক উল্লেখ সময়ের সীমারেখাকে ভেঙেচুরে দেয়; বাস্তবকে আরো সম্প্রসারিত করে। উপন্যাসের প্রথম লাইনটির কথাই ভাবা যাক— ‘Many year later when Colonel Aurelion Buendio faced the firing squad he was to rememer the day when he went with his father to discover the ice..’ কি আশ্চর্য, discover the ice মানে? বরফ আবিষ্কার করা? সত্যিই আমরা বুঝতে পারি অব্যবহিত পরেই, যেসময়ের কথা বলে উপন্যাস শুরু হচ্ছে, মানুষের ভাষাই তখনও ঠিকমত গড়ে ওঠেনি, তাই এমনকী অনেক জিনিষের নামকরণ পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু ইতিহাসের বাস্তবে সভ্যতার যে স্তরে এমন অবস্থা ছিল তার সঙ্গে উপন্যাসের বাস্তবতার স্তরটি আদৌ খাপে খাপে মেলে না। বোঝা যায় আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে এই দুটি বাস্তবতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরে গোটা উপন্যাস জুড়েই এমন ঘটনা - পরম্পরা চলতে থাকে যেখানে অত্যাশ্চর্য আর সাধারণের সীমারেখা ঘুচে যায়। মাকোন্দো নামক স্থানটিতে তিন বছর ধরে বৃষ্টি পড়ে, রেমেডিওস দ্য বিউটি নামে এক পরমাসুন্দরী কিশোরী আকাশে উঠে যায় সতের জন অরেলিনো বুয়েন্দিয়ো জন্মায় কপালে অমোচনীয় দাগ নিয়ে এবং একজন বাদে সকলেই কপালে গুলি খেয়ে মারা যায় আলাদাভাবে এক অভাবনীয় ঘটনা নিয়ে আমরা আদৌ বিড়ম্বিত হই না কারন এটা উপন্যাসের মূল আঙ্গিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। একটু মনোযোগ দিয়ে মার্কেজের সাহিত্য পড়লেই বোঝা যায় অল্প বয়স থেকেই এই আঙ্গিক তার আয়ুধ হয়ে উঠেছিল অনায়াস ছন্দে। মাত্র উনিশ বছর বয়সে লেখা ‘নাইট অব দ্য কার্লিউস’ গল্পটির কথাই ধরা যেতে পারে। একটা কাফের মধ্যে তিনটি লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে যাদের চোখ কার্লিউ পাকি তুলে নিয়েছে। তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করছে না। শুধু যেদিকে তারা হেঁটে যাচ্ছে সেদিকেই একটা দেয়াল তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে। অথবা আরেকটু পরিণত বয়সে লেখা ‘দ্য সি অব লস্ট টাইম’ যেখানে জলের তলায় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে একটা গোটা জনপদ এবং সেখানকার গোলাপ ফুলের সুগন্ধ সমুদ্রের জল থেকে উঠে আসার পরও ডুবুরির শরীরে জেগে থাকে।

তা, শুধু মার্কেজই তো নন, গোটা লাতিন আমেরিকা মহাদেশ জুড়েই জাদুবাস্তবতা নামক আঙ্গিকের মাধ্যমে বাস্তবতার অচেনা স্তরগুলি ক্রমশ আবিষ্কৃত হচ্ছিল, এক স্বপ্নসম্ভব বাস্তবতাকে শিল্পের মুকুরে প্রতিফলিত করছিলেন অনেক লেখক। কিউবার লেখক আলেহো কার্পেন্তিয়ারের ‘উৎসের দিকে’ গল্পটি পাঠক বিবেচনার মধ্যে আনতে পারেন (এটি বাংলায় মানবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত এবং দেজ পাবলিশিং প্রকাশিত আলেহো কার্পেন্তিয়র রচনা সমগ্রের অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্তমানে বইটি পাওয়া যায় কিনা জানিনা)। এখানে মৃত্যুশয্যায় শায়িত এক সামন্তপ্রভু এবং তার ভগ্ন বাসগৃহের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক সময়ের ঘড়িকে উল্টো দিকে চালাতে শুরু করেন। না, নিছক ফ্ল্যাশব্যাক এক নয়। বরং সামন্তপ্রভু অনুভব করে যে সে ক্রমশ শৈশবের দিকে ধাবিত হচ্ছে, হয়ত অস্তিত্বগ্রহণের আগে

মুহূর্তের দিকে। শেষে বাড়িটির ইট, কাঠ, বালি সবকিছুই প্রকৃতির বুকে ফিরে যায়। যে মজুরেরা বাড়িটি ভাঙার বরাত পেয়েছিল তারা এসে দেখে সেখানে কিছু নেই, বিরাট শূন্যতা হাঁ করে রয়েছে।

রুবেন দারিও, হুয়ান রুলফো থেকে শুরু করে হোর্হে বোর্হেস, জুলিও কোর্তাজার, মিগুয়েল অ্যাসতুরিয়াস হয়ে কার্লোস ফুয়েন্তেস বা মারিও ভার্গোস লোসা পর্যন্ত কিংবা তাকেও ছাড়িয়ে লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের যে বিরাট বহমান ঐতিহ্য, সেখানে অবশ্য শুধু জাদুবাস্তবতা নয় আরো হরেক রকম সমৃদ্ধ আঙ্গিক বা বাচনভঙ্গী কথ্যবস্তুর বাস্তব বা পরাবাস্তবকে মূর্ত করে তোলে। এদের সকলের রচনাকে এই আলোচনার মধ্যে টেনে আনার সাধ্য বা অবকাশ কোনোটাই অবশ্য আমার নেই। সহজপ্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তার নিরিখে মার্কেজকে প্রতিনিধিস্থানীয় ধরে নিয়েও যদি আমরা এগোই তবে দেখব নেহাত জাদুবাস্তবতার আঙ্গিকই নয়, দার্শনিকভাবে যৌক্তিক কার্যকরণ সম্পর্কের শৃঙ্খলাকে নানাভাবে অগ্রাহ্য করেই লাতিন আমেরিকান সাহিত্য স্বপ্ন বা বাস্তবতার এক প্রতিস্থাপনীয় আদর্শকে নির্মাণ করতে চেয়েছে। মার্কেজের কলেরার সময় ভালবাসা' থেকে এই 'অযুক্তির' শক্তি ও সামর্থ্যকে আমরা সহজেই চিনে নিতে পারব। এই উপন্যাসের নায়ক কিশোর বয়সে একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিল। মেয়েটির বাবা মা এই সম্পর্কের বিরোধিতা করে তাকে দূরে মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। দু'বছর ধরে মেয়েটি শুধু ছেলেটির কথাই অনুক্ষণ ভেবে যায়। এরপর ফিরে এসে যখন মেয়েটি ভাবছে ছেলেটির সঙ্গে এতদিন পরে দেখা হবার পর কী বলবে এবং ছেলেটিকে দেবার মত উপহার কেনার জন্য বাজারে ঘুরছে সেই সময় আচমকা মুখ ঘুরিয়ে বাজারের মধ্যে অনুসরণরত ছেলেটিকে দেখতে পায়। আচমকা অদ্ভুত এক বীতরাগে ছেয়ে যায় তার মন। সে বলে ওঠে, 'চুলোয় যাও তুমি। এইখান থেকে উপন্যাসের মোড় ঘুরে যায়। মার্কেজ এই অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত বীতরাগ, অনুভূতির এই বিপ্রতীপ চলনের কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন না। অর্থাৎ উপন্যাসে আমরা যে কার্যকারণ সম্পর্কের শৃঙ্খলা খুঁজি তাকে অযুক্তির আঘাতে এইভাবে বিপর্যস্ত করে দেন মার্কেজ। কিন্তু তাঁর দক্ষতা এইখানেই যে এই অযুক্তিকে কখনও অবাস্তব মনে হয় না। উপন্যাসের শেষাংশে যখন ঐ মেয়েটি সত্তর ছুঁই ছুঁই এক বৃদ্ধা, স্বামীর মৃত্যুর পর তার সেই একদা কিশোর প্রেমিকের সঙ্গে তার আবার সংযোগ স্থাপিত হয়। সেই বৃদ্ধের সঙ্গে তার শারীরিক মিলনের যে দীর্ঘ বর্ণনা মার্কেজ দেন তাও এইভাবে যুক্তি আর বাস্তবের চেনা অনুষঙ্গগুলিকে অতিক্রম করে যায়।

লাতিন আমেরিকার স্বৈরশাসকদের এক প্রতিনিধিকে নিয়ে মার্কেজের এক আশ্চর্য উপন্যাস 'কুলপতির হেমন্ত' (Autumn of the patriarch)। এতখানি আঙ্গিকসিদ্ধ এই উপন্যাস যে অনেকে একে মার্কেজের শ্রেষ্ঠ রচনা বলতেও দ্বিরুক্তি করেন নি। গোটা লাতিন আমেরিকা মহাদেশ জুড়ে স্বৈরতন্ত্রের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা অনুমান করতে পারবেন অভাবনীয়, অকল্পনীয় সেই ইতিহাসকে সাহিত্যের পরিসরে স্পর্শ করতে গেলে কী পরিমাণ কল্পনাশক্তি ও আঙ্গিকনৈপুণ্য দরকার। শুধু জাদুবাস্তবতা নয়, আঙ্গিকের যে সকল কৃৎকৌশলের প্রয়োগের মাধ্যমে মার্কেজ সেই সিদ্ধি অর্জন করেন তার একটিমাত্র এখানে উল্লেখ করছি। এই উপন্যাসে এক একটি দীর্ঘ বাক্য চলতে থাকে পাঁচ - ছয় পাতা ধরে। দাঁড়ি পড়ার আগে। একই বাক্যের মধ্যে অনেক সময় কথকও পাল্টে যায়। আসলে স্বৈরতন্ত্রের এক কালাতীত ব্যাপ্তিকে এখানে মার্কেজ চিহ্নিত করতে চান। তাই এই আঙ্গিক তার বিষয়ভাবনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি তা যে দ্রষ্টা - নিরপেক্ষ নয়, এই সত্য তো আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বর উদ্ভবের পর বৈজ্ঞানিকভাবেও স্বীকৃত। আকিরা কুরোশাওয়ার 'রশোমন' ছবিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, সত্যের এই খন্ডিত চেহারা আমাদের বিমূঢ় করেছিল। রশোমনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি ধর্ষণের ঘটনা। মার্কেজ একটি হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে রচনা করেন বাস্তবের এক বহুমুখী ভাষ্য তাঁর 'chronicle of a death faretold' উপন্যাসে। এখানে জাদুবাস্তবতা আঙ্গিকের একটি উপাদানমাত্র। আসলে যে কথাটা বলতে চাইছি তা হল, বাস্তবের গভীরতর মাত্রাকে আবিষ্কার করার জন্য মার্কেজ তথা লাতিন আমেরিকার লেখকদের কাছে জাদুবাস্তবতা একটি আয়ুধ মাত্র, কিন্তু একমাত্র এবং অপরিহার্য নয়। মার্কেজের উপন্যাসিক 'কর্ণেলকে কেউ চিঠি লেখে না।' —আমাদের চেনা বাস্তববাদী ঢংয়ে লেখা। আবার সাইমন বলিভারকে নিয়ে লেখা তার ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দ্য জেনারেল ইন হিজল্যাবিরিন্থ' কিংবা চলচ্চিত্রকার মিগুয়েল লিত্তিনের জবানিতে লেখা 'চিলিতে গোপনে' -ও প্রায় তাই। সাম্প্রতিকতম উপন্যাসের মধ্যে 'of love and other demons'-এর শেষাংশে জাদুবাস্তবতার অসাধারণ প্রয়োগ আছে। শেষ উপন্যাস 'আমার বিষাদবেশ্যাদের স্মৃতি' কে আমি হিসেবের মধ্যে রাখছি না, শৈল্পিক ব্যর্থতার কারণে। তবে যাঁরা মার্কেজের লেখায় স্বপ্ন ও বাস্তবের এই দোলাচল এবং মায়াবী আচ্ছন্নতার উৎসমুখ খুঁজে পেতে চান তাঁদের অবশ্যই মার্কেজের আত্মজীবনী 'Living to tell a tale' এবং সাক্ষাৎকার গ্রন্থ 'Fragrance of guava' পড়তে হবে। একটু মার্কেজীয় ঢংয়ে আমরা এখানে বলতে পারি 'বুড়ো গ্যাবো' (মার্কেজকে বন্ধুরা যে নামে ডাকে) আসলে এই পৃথিবীর নয়, কোনো ছায়াজগত থেকে সে পৃথিবীতে এসেছিল আমাদের গল্প শোনাবে বলে। কাজড শেষ হলে সেখানে ফিরে যাবে সে। এটাই হয়ত শেষ বিচারে মার্কেজীয় জীবনবীক্ষা।

পাদটীকা অথবা কিছু অগ্রথিত ভাবনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত শিল্পী সাহিত্যিকদের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। বিপুল মানবিক অপচয়ের সামনে শিল্পের নান্দনিক মূল্য সম্বন্ধে অনেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই সময় চিত্রকলার প্রেক্ষিতে, বিশেষত তিস্তান জারাঁর নেতৃত্বে উদ্ভূত হয় দাদাবাদী আন্দোলন (Dadaism)যেখানে অকিঞ্চিৎকর, অপাঙ্‌ক্তেয় বস্তুনিচয়কে শিল্পকর্মের উপজীব্য করে তোলা হয়। কালক্রমে এই আন্দোলনের গর্ভ থেকেই জন্ম নেয় স্যুররিয়েলিজম বা অতিবাস্তবতাবাদ। ১৯২১ সালে কবি আঁদ্রে ব্রেঁতোঁর উদ্যোগে প্রকাশিত হয় স্যুররিয়েলিজমের ইস্তাহার। কবিতা, চিত্রকল্প এবং চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল প্রচন্ড। ফ্রান্সে পল এলুয়ার বা লুই আরাগঁর মত গুরুত্বপূর্ণ বামপন্থী কবিরা একসময় এই আন্দোলনের সহযোগী ছিলেন। এই আন্দোলনের একটি ধারায় 'Automatic Writing' -এর ধারণাটি গুরুত্ব পেয়েছিল। সেই জন্যই বোধহয় কেউ কেউ স্যুররিয়েলিজমকে মগ্নচৈতন্যবাদ নামে অভিহিত করতে চেয়েছেন যদিও বুৎপত্তিগতভাবেই এই শব্দটি ভুল। তবে স্বীকার করতে হবে যে, কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের প্রভাব বারবারই খুব সীমিত থেকেছে।

ষাটের দশকের শেষভাগ থেকেই প্রথম ফ্রান্সে এবং তারপর গোটা ইউরোপ জুড়ে সাহিত্য ও শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিহ্নতত্ত্বর (semiology) প্রয়োগ শুরু হয়। ভাষা যে মূলত দ্যোতক (signifier) এবং যাকে সে দ্যোতিত করে (Signified) তার যে কোনো

শাশ্বত অর্থ (transcendental meaning) নেই একথা তাত্ত্বিকভাবে জেনে ফেলার পর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পথ আরো উন্মুক্ত হয়ে ওঠে। রলাঁ বার্ত কেরানীশিল্পী এবং উপাসকশিল্পীর মধ্যে তফাৎ করেছিলেন এইভাবে যে প্রথমোক্তরা প্রচলিত দ্যোতক - দ্যোতিত সম্পর্কের পুনরুৎপাদন করে মাত্র, কোনো পরিবর্তন করতে পারে না; অপরপক্ষে দ্বিতীয়োক্ত গোত্রের শিল্পীরা নানা উদ্ভাবনের মাধ্যমে এই সম্পর্কের শৃঙ্খল ভাঙেন। ফলত আমাদের চেনা বাস্তবতা এক অচেনা চেহারায় উদ্ভাসিত হয়।

সত্তরের দশকে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষাবাদী ধারণাগুলো এক নতুন ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংশোধিত ও সংযোজিত আকারে হাজির করেন ফরাসী ভাবুক জাক লাকাঁ। এই ব্যাখ্যা সাহিত্য ও শিল্পের বিভিন্ন ধারাকে প্রচন্ড প্রভাবিত করে। বাস্তব, কাল্পনিক এবং অবচেতন সম্বন্ধে এক নূতন পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচিত হতে থাকে। শিল্পীর সচতেন সক্রিয়তা এবং অন্তর্লীন অচেনা আবেগের মধ্যে শিল্পকর্মের প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনটি আসলে নিয়ামক সেই প্রশ্নটিও উঠে পড়ে। মিশেল ফুকো এ দুয়ের মধ্যে কোনো একটা রফায় পৌঁছতে চেয়ে বোধহয় 'Unconseious structuring' শব্দবন্ধটি উপহার দেন আমাদের।

বাস্তবতার বিপরীতে সবসময় স্বপ্ন অথবা মায়াকেই বুঝব আমরা তা নয়। বাস্তবতার আড়ালে নিহিত অন্তর্লীন বাস্তবতা বা প্রকৃত বাস্তবতাকে আবিষ্কারও শিল্পীর কাজ হতে পারে। দার্শনিকভাবে বলতে গেলে অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) এর পরত ছাড়িয়ে বাস্তবতার গভীর গঠনের ভেতর (যাকে চমস্কি বলবেন 'Deep structure.') যাওয়াটাই প্রকৃত বাস্তববাদকে (realism) খোঁজা। এই লক্ষ্যে গত শতাব্দী জুড়েই অনেক শিল্পী শিল্পের ভাষাকে সামনে নিয়ে এসেছেন (foregrounding), ভাষা ও আঙ্গিককেই করে তুলছেন নিরীক্ষা ও মন্তব্যের যোগ্য (self - reflexivity)। সাহিত্যের ক্ষেত্রে জয়েস, নাটকের ক্ষেত্রে ব্রেখট এবং সিনেমার ক্ষেত্রে গোদার এ ব্যাপারে ভুনবিদিত দৃষ্টান্ত। পরে এই প্রবণতা শুধু যে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন শিল্পের সহায়ক হয়েছে তাই নয়, ন্যারেটিভের সীমা অতিক্রমণেও সহায়তা করেছে। এই কাজ পিকাসো করে দেখিয়েছেন চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে।

বাস্তবতার দিকে পিছন ফিরে নিছক স্বপ্নজগতে মানসভ্রমণ কোনোদিনই সাহিত্যের জগতে সার্থকতা পায়নি। যদি তা পেত তবে ব্রেতোঁর ইস্তাহার প্রকাশের কুড়ি বছরের মদ্যেই স্যুরলিয়ালিজমের মৃত্যু ঘটে যেত না। আসলে সাহিত্য ক্রমশঃ সব সঙ্কীর্ণতা বর্জন করে হয়ে উঠতে চেয়েছে বহুস্বরবিশিষ্ট (polyphonic)। সেখানে মানুষের গূঢ়তম স্বপ্ন যেমন, তেমন নিছক দলিল - দস্তাবেজ্য বিষয় হয়ে উঠতে পারে। তবে গোটাটা মিলে যে - ভাষায় শিল্পী আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন সেটা অবশ্যই হওয়া চাই বাস্তবোত্তর এক দ্যোতনার অংশ। সংকেত বা রূপকের সাহায্যে বাস্তবের গভীরতর ব্যঞ্জনাকে আবিষ্কার করা সাহিত্যের এক প্রচলিত কৌশল। কাফকার উপন্যাসগুলি তো আছেই, জর্জ আরওয়েলের 'পশুখামার' প্রকাশের পরও তো কিঞ্চিদধিক ষাট বছর কেটে গেছে। কিন্তু যত মুক্ত কল্পনারই আশ্রয় নেওয়া হোক না কেন, একইসঙ্গে এমনকী রূপকাশ্রিত রচনাতেও অন্তর্লীন বাস্তবতার নীতিকে অনুসরণ করতে হয়, বরং আরো কঠোরভাবে। নেবোলজয়ী স্প্যানিশ সাহিত্যিক হোসে সারামাগোর উপন্যাস 'ব্লাইন্ডনেস' এর একটি সার্থক উদাহরণ, যেখান একটি শহরের আধিবাসীদের মধ্যে সংক্রোমক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ে অন্ধত্ব। আপাত - অবিশ্বাস্য এই ঘটনার প্রেক্ষিতে চরিত্রগুলির মানসিক অনুভূতি এবং বাহ্যিক পরিবেশের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ সমন্বিত যে 'বাস্তববাদ' তা ঈর্ষণীয়ভাবে সফল।

আমাদের এখানে, বাংলায়, 'জনপ্রিয়' সাহিত্যিকরা সাহিত্যের নামে বিবরণধর্মী অভিজ্ঞতাবাদী আখ্যান পেশ করে চলেছেন। অন্যত্র কিন্তু এক্ষেত্রেও স্বপ্ন, বাস্তবতা এবং অতিবাস্তবতার সীমানাগুলি পুনর্নির্ধারণ করার কাজ চলছে। জাপানের অন্যতম জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হারুকি মুরাকামির সাম্প্রতিকতম উপন্যাস 'কাফকা অন্য দ্য শোর' পড়লে সেকথাই মনে হয়। ইংরেজী অনুবাদে ৬১৯ পৃষ্ঠার বইটি শুরু করলে শেষ না করা পর্যন্ত থামা যায় না, ইংরেজীতে যাকে বলে, 'Unputdownable'। অথচ উপন্যাসের কোথাও চেনা বাস্তবতার ক্লান্তিকর, একঘেয়ে, সাংবাদিকসুলভ বিবরণ নেই। আছে কল্পনার ঐশ্বর্য, ভাবনার দ্যুতি, আঙ্গিকের চমক ।

সবশেষে সমাজের কথাটা, সামাজিক ব্যবস্থার কথাটা আবার ফিরে আসে। পুঁজি এই সমাজের সবকিছুকেই গ্রাস করছে। সেখানে সাহিত্যই এখনও আপাত পরিশুদ্ধির জায়গা। যে - সাহিত্য সার্থক হয়ে উঠল আর যেটি হয়ে উঠল না দুটিই আদতে মানবিক প্রয়াস যদি তাতে সততা ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর জেগে থাকে। আর যেহেতু এটি সাহিত্য - নিছক কোনো গবেষণাকর্ম নয়, তাই আর যা লাগে তা হল স্বপ্ন, কল্পনা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং বাস্তবতা সম্পর্কে এক বিশ্লেষণী দক্ষতা। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বোঝা যায়, জাদুবাস্তবতা কোনো লাতিন আমেরিকান সাহিত্যপ্যাকেজ নয়—বস্তু সাহিত্যের এমন কোনো প্যাকেজ হয় না, যেটা হতে পারে সেটা হল বাস্তবের বহুবর্ণ আবিষ্কার ক্যালাইডোস্কোপে চোখ রাখার একটা পদ্ধতি।